সংস্কৃতি, না বিকৃতি

গোপাল হালদার

[১৯৪৭ সালে প্রকাশিত বিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'মেঘনা' সাহিত্য সংকলন থেকে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হল ঐতিহাসিক কারণে। দেশভাগের সময় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানসিকতার পেছনে সক্রিয় ভূমিক ছিল মুসলিম লিগ এবং কংগ্রেস। ধর্মের উৎকট গোঁড়ামী হিন্দুর আচারে মুসলমানের জীবনে, মনে প্রাণে কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাহিনী, শরিয়ত সম্মত পাকিস্থান-এর দাবিতে। সাধারণ মুসলমানরা সুকৌশলে হিন্দুদের রক্ষা করেছে। অন্যদিকে হিন্দুর বিভেদের সংস্কৃতি বাবু কালচারে সীমাবদ্ধ। মুসলমান সংস্কৃতিতে রয়েছে উপরিতলার minority culture হয়ে। বর্তমান নিবন্ধে লেখক নোয়াখালির হিন্দু এবং বিহারের মুসলমান হাজারে হাজারে নিহত হয়েও তাদের দ্বিধা আছে, শঙ্কা আছে। লেখকের মতে আধুনিক মানবতা নয়, সংস্কৃতির বিকৃতি—লেখকের সংগ্রাম হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত সমান স্বার্থকে আশ্রয় করে, সম্মিলিত শক্তিকে প্রয়োগ করে, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন শক্তিশালী করে। বর্তমান সময়ে যার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য—সঃ বিঃ]

আমি 'নোয়াখালির গোপাল হালদার'—ষোলই আগস্টের সকালবেলায় কলকাতায় আমার হিন্দুস্থান এলাকায় নিরাপদে বসেও তাই শিউরে উঠছিলাম—সমস্ত পূর্ববাংলার ভয়াবহ ভবিতব্য যেন আমার চোখের সামনে ফুটে উঠছিল, ফুটে উঠছিল আমার জন্মভূমি ঢাকার গ্রাম ও শহরের সম্ভাব্য রূপ, ফুটে উঠছিল আমার আশৈশব আত্মীয় নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলের অগ্নিগর্ভ নিয়তি। সে কারণে সেই আগস্টের অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বেই চিন্তা না করে পারিনি 'মুসলিম কালচারে'র কথা (দ্রঃ যুগান্তর, শারদীয় ১৯৫৩), 'বাংলার মুসলমান কালচার'-র সত্যকার বিকাশ-পদ্ধতির কথা (দ্রঃ দৈনিক বসুমতী, শারদীয় ৫৩)। সে কারণেই ষোলই আগস্ট সকালবেলা থেকেই শিউরে উঠছিলাম পূর্ববাংলার, বিশেষ করে নোয়াখালি চট্টগ্রামের হিন্দুদের ভয়ঙ্কর বিপদের কথা ভেবে—কারণ আমি নোয়াখালির গোপাল হালদার—শতকরা আশিজন মুসলিম প্রতিবেশীর সমাজে শতকরা বিশজনের একজন হয়ে জন্মেছি, বেড়ে উঠেছি, বুঝেছি কত কম চিনি আমার প্রতিবেশীকে, আরও বুঝেছি কত পর সেই প্রতিবেশীর চোখে রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম-বিবেকানন্দের সৃষ্টি এই বাঙালি কালচার। আমার পক্ষে তাই 'বিচার'-সুলভ স্থূলতা হিন্দুয়ানির কাগুজে হুঙ্কার ছিল অসম্ভব। অথচ সেদিনও পেশাদারি হুঙ্কারের দিন। তবু এ যুগের ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে সেদিন আমার পক্ষে না বুঝে উপায় রইল না—যুগান্তরের সেই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে ভারতীয় স্বাধীনতার অন্দোলনই সেদিন, ষোলোই আগস্ট, হয়েছে প্রথম 'ক্যাজুয়েলটি' (দ্রঃ ছাত্র অভিযান, সেপ্টেম্বর)। কলকাতার রাস্তায় রাজত্ব স্থাপিত হয়েছে এক বিশেষ ধরনের গাড়ির আর বিদেশী সৈনিকের (স্বাধীনতা, শারদীয় সংখ্যা) ভোলবার পথ দেখলাম না—

ভ্রাতৃহত্যার এই অধ্যায় কেন বাংলায়, বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদীয় প্রাণকেন্দ্র কলকাতা শহরেই। ব্রিটিশ বণিক ও আমলাতন্ত্রের এবং হিন্দুস্থান মালিক গোষ্ঠীর ও পাকিস্তান মালিক গোষ্ঠীর মুনাফার মৃগয়া এই ভ্রাতৃঘাতী চক্রান্তে উদঘাটিত হওয়াই তো অনিবার্য (দ্রঃ ইস্টার্ন এক্সপ্রেস, শারদীয় সংখ্যা)। তবু যুদ্ধান্তের ভারতীয় জনতার অভিযানকে মিথ্যা মনে করতে পারলাম না, ভুলতে পারলাম না '২১শে নভেম্বর থেকে ২৯শে জুলাই'। সমস্ত প্রতিক্রিয়ার এই ঝড়ের মধ্যেও 'সোনার ভারতের' মুক্তিপথের সন্ধান পেয়েছে নতুন ভারতের রাজপুত্র—জনসমুদ্রের তল থেকে যে এবার এক ডুবে তুলে আনবে এই রাক্ষসী-শাসনের প্রাণের কৌটা, ছিঁড়ে ফেলবে তার প্রাণ-ভোমরা (দ্রঃ শতাব্দীর লেখা, 'সোনার ভারত')—এই আশার স্বপ্নও চোখে জাগল সেই আগস্টান্তের শারদীয় দিনে, যুদ্ধান্তের ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

নোয়াখালির সাক্ষ্য

তাই ষোলই আগস্টের ভ্রাতৃরক্তই আমার চোখ থেকে একেবারে মুছে দেয়নি উনত্রিশে জুলাই-এর কলকাতা। জগৎজোড়া জনজীবনের বিপুল অভিযান আমার দেশে ভ্রাতৃরক্তের পিচ্ছিল পথে নিমজ্জিত না-হয়ে এগিয়ে যায়—এ সত্যটাই আমি দেখছি, নোয়াখালির গোপাল হালদার, দেখছি আগস্টের কলকাতায়, দেখছি অক্টোবর নোয়াখালিতে, আর দেখছি আজ, নভেম্বর-ডিসেম্বরে বিহারে।

ঝটিকাহত পক্ষীর মত নোয়াখালি থেকে ফিরছিলাম। পথে বারে বারে নিজেকে জিজ্ঞাসা করছিলাম—ভারতের স্বাধীনতা কি এবারের মত 'ক্যাজুয়েলটিই' হয়ে রইল? শুধু নোয়াখালির হিন্দু, পূর্ববাংলার হিন্দু, বাংলার হিন্দুর দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে কি ভারতের ভাগ্যও অন্ধকার হয়ে গেল না?

তখনো ব্রিটিশ বেয়নেট বা স্বদেশী পুলিশের রাইফেলের প্রায় দর্শন মেলে না; উপদ্রুত অঞ্চলের লৌহবেষ্টনী ভেদ করবার কোনো আয়োজন নেই, অনুপদ্রুত অঞ্চলের জীবনও বিভ্রান্ত জনতার হাতে, বেতসপত্রের মত কাঁপছে শহরের গ্রামের ত্রাসগ্রস্ত নরনারী—মন্ত্রী ও লাটেরা, রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস নেতারা, তখনো পর্যন্ত শূন্যাবলোকনের অপেক্ষা বেশি কর্মদক্ষতার পথ নোয়াখালিতে দেখছেন না; আর নোয়াখালির বণিক ব্যাঙ্কাররা তখনো কলকাতায় আসেনি—সুব্যবস্থায় আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন, কাগজে কাগজে প্রকাশিত হচ্ছে উপদ্রুত নানালোকের ভীতি-ভ্রান্তিবিকৃত বিবৃতি—অসহায় ও অসুস্থ হয়ে আমি ছাড়ছিলাম নোয়াখালি। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে, তার তলায় চাঁদপুর ঘাটের মুক্ত প্রাঙ্গণে ঘর-ছাড়া সহস্র নরনারী শিশু বালক-বালিকা; ক্ষুদ্র শহরের বন্দরে, গুদামে, ঘরে-বাইরে আরও বহু

সহস্র তেমনি গৃহহীন নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল অধিবাসী। রেলপথের স্টেশনে স্টেশনে ভিড়, স্টিমার ঘাটের চারদিকে সর্বত্র অপেক্ষমান যাত্রী সকলের চোখে শঙ্কা ও ত্রাস, অসহায়তা ও ব্যাকুলতা, সমস্ত পূর্ববাংলার হিন্দু পথ না জেনে, গন্তব্য না বুঝে, ভবিষ্যৎ না ভেবে বেরিয়ে পড়েছে বাইরের পথে। হিন্দু বন্ধুকে তুলে দিতে এসেছেন যুবক মুসলমান দোকানি, সলজ্জ দুঃখে বলছেন, 'কি করে থাকতে বলি আর? আমার নিজ সম্প্রদায়ের লোকেরা চোখের সামনেই দেখছি আপনাদের ঘর দুয়ার ভেঙেচুরে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নানা উপদ্রব করছে?' জানি, এমন যুবকেরা সংখ্যায় অল্প, তবু তাঁরা আছেন। আছেন বলেই নোয়াখালির সংবাদ দুর্বৃত্তদের দেয়াল ভেঙেও বাইরে এসে পৌঁছায়। বাঙলার সরকারি বাধা যতদিন নোয়াখালি সংবাদ কলকাতায় আমাদের কান থেকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছে, নোয়াখালির দুর্বৃত্তরা কিন্তু ততদিন সে সংবাদ নোয়াখালির সাধারণ মানুষের সরকার কর্মচারীর নিকট থেকে দূরে রাখতে পারেনি। নোয়াখালির সাধারণ মুসলমানের সদিচ্ছা একেবারে পরাহত হয়নি—মাঝে মাঝে গোপনে বা চতুরতার সঙ্গে অবরুদ্ধ এলাকা থেকে সংবাদও তারা বহন করে মাঝে মাঝে উপদ্রুতদেরও কারো কারো বহির্গমনের উপায় করে দিয়েছে। কিন্তু যতটুকু এ সদিচ্ছা সার্থক হয়েছে তার চেয়ে বেশি পরাভব স্বীকার করতে তা বাধ্য হয়েছে। কারণ তার পিছনে প্রথমত এসে দাঁড়ায়নি তার দেশের শাসক শক্তির অকুণ্ঠ সমর্থন, কিংবা তার পিছনে মুসলমান সমাজের সাধারণ নৈতিক সমর্থনও সে সংগ্রহ করতে পারেনি।

মুসলমি দৃষ্টিভঙ্গি

এই মানবতার পরাজয়ই বাংলার মুসলিম লিগের চরম গ্লানি ও চরম কলঙ্কের কথা। দেখলাম, কি কলকাতার মুসলিম নেতা কি নোয়াখালির লিগ নেতা কারো মুখে এমন নির্মম ও শোচনীয় ঘটনার জন্য যথোচিত লজ্জাবোধ বা বেদনার দাগ নেই; আছে নালিশ—হিন্দু সংবাদপত্রের অতিরঞ্জনের বিরুদ্ধে। এইসব মুসলমান নেতাদের দিক থেকে অনুপদ্রুত অঞ্চলের শান্তিরক্ষার চেষ্টা আছে, উপদ্রুতদের উদ্ধারের কিন্তু সক্রিয় চেষ্টা প্রায় নেই, বেষ্টনী ভাঙবারও চেষ্টা নেই। অথচ তাঁরা প্রবলভাবে চেষ্টা করছেন তখন সে জেলায় ফৌজ বা অস্ত্রধারী পুলিশ আগমন বন্ধ করবার জন্য, ফৌজপুলিশ নিতান্ত যদি আসে তাহলে কার্যত সেই পুলিশ ও ফৌজের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ রাখার জন্য। আর এ জন্যই তাঁরা প্রাণপণে সমস্ত ঘটনাকে 'সামান্য' বলে প্রমাণ করতে ছিলেন উদগ্রীব। স্থানীয় লিগ ও স্থানীয় মুলমান নেতৃত্বে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্য আরো ব্যস্ত ছিলেন এ কথা বোঝাতে যে এই কুৎসিত আচরণের নায়কদের সঙ্গে লিগের কোনো সম্পর্ক নেই, এবং আসলে দুর্বৃত্তদল এ জেলার লোকও হতে পারে না, আর যা ঘটেছে তা হচ্ছে নিতান্তই

শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতদের উত্থান।

মামলা সাজাবার প্রয়োজনে যে ওজর-আপত্তিই উত্থাপিত হোক, আমি নোয়াখালির গোলাপ হালদার, আমি জানি এখানকার শতকরা ৮০টি মানুষের জীবনযাত্রার অনেক সূত্রই আজ অন্যধর্মাবলম্বী এক-আধজন মহাজন ও জমিদারের মুঠোতে, জানি এ জনতার লোকসংখ্যা বাড়ছে, খাদ্য সঙ্কুলান হয় না, মন্বন্তরে মহামরীতে মরেও তারা ক্ষয় হয়নি, জানি এই শতকরা ৮০ জনই এ জেলার কৃষির, এ জেলার শিল্পোৎপাদনের বাহক। ধর্মের গোঁড়ামি উৎকট এখানকার হিন্দুর আচারে আর মুসলমানের জীবনে, মনে, প্রাণে। আমি জানি ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি মোল্লা ও মৌলবি তৈরী হয় নোয়াখালির মক্তবে মাদ্রাসায়। এখানকার মুসলমানের জীবনযাত্রার প্রতিটি আচরণ বিচরিত হয় শরিয়তের নিয়ম কানুন দিয়ে; তাদের অভাবগ্রস্ত মনের সম্মুখে গত দশ বছর ধরে চিত্রিত হয়েছে কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাহিনী, লিগের প্রচারিত এক শরিয়ত-সম্মত 'পাকিস্থান'—আর সেই লিগ মন্ত্রীত্বের সুযোগেই ১৯৩৭ থেকেই এই রামগঞ্জের দুধর্ষ ও দুর্দশাগ্রস্ত মুসলমান সমাজে লিগ বেলিগ মন্ত্রীদের সমাদরে লালিত পালিত ও বর্ধিত হয়েছে এই জেহাদের নায়ক দেহরার পীরের পুত্র, তারপর গত দুমাসে কলকাতা হত্যাকাণ্ডের পর সে কর্তৃপক্ষের চোখের ওপর গঠিত করেছে গুণ্ডাদের ও প্রাক্তন সৈন্যদের বাহিনী। সমস্ত পথ নিজেকে এই জিজ্ঞাসা করতে করতে এলাম, এখনো যখন এমন মর্মন্তুদ ব্যাপারের অনুরূপ বেদনাবোধ এদের প্রাণে জাগেনি—যখন মুসলমান উকিল বন্ধু বলছেন, 'একে (একজাকশান্) নারী অপহরণ তো বলা চলে না, কারণ, ধর্মান্তরিতা হয়ে যে নারী তাকে তার নূতন ধর্মানুয়ায়ীই যখন বিবাহ দেওয়া হয়েছে, তখন তো ব্যাপারটা আইনসঙ্গত বলতে হবে।' যখন রেলের সহযাত্রী-সাথীকে বলতে শুনেছি যে-ইস্তাহার সোহারাবর্দির নামে আকাশ থেকে বিলি হয়েছে, 'সে ইস্তাহার বিলি করেছে আসলে শরৎ বোস ও কৃপালনী', যখন স্টিমারের শুনলাম ২৪ পরগণাগামী নোয়াখালির মৌলবি গৌরবে ব্যাখ্যা করছেন, 'আসলে আমাদের জিলার মুসলমান ভয়ানক ধর্মভীরু, কাউকে তারা মারতে চায়নি, শুধু বলেছে 'দীন গ্রহণ করতে', যখন রাজবাড়ির প্লাটফর্ম ধ্বনিত হতে শুনলাম, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' আর সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন গৃহত্যাগীর উদ্দেশ্যে—'যা পূর্ববাংলা ছাড়লাম, পশ্চিম বাংলায়ও তোদের স্থান রাখব না—তখন বারবারই নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি হিন্দুর বাস আর সম্ভব? আশিজন যেখানে তাদের চায় না, সেখানে বিশজন থাকবে কোন দুঃখে, কোন স্বস্তিতে, কোন ভরসায়? দুর্লভ রাজকীয় বেয়নেট ও বুলেটের সহায়তায়?

ব্রিটিশ বিলাশ

কলকাতায় মিতভাষী মিঃ মার্টিনের উক্তি শুনেছিলাম—সব সুনিশ্চিতরূপে (ডেফিনিটলি)

থামানো হয়েছে, ঠিক যখন (১৭ই) হাইমচর জ্বলছিল এবং বাজেপ্তি, গোজিন্দিয়া, পাইকপাড়া জ্বলবার অপেক্ষায় রয়েছিল। পরে লেবর লাটের রিপোর্টে পড়েছি—'ব্যাপারটা সামান্য।' দেখেছি লিগ নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাকইনার তো নারী হরণের কথাই শোনেননি! ঘটাস্থলে যাবার আগে ব্রিটিশ সেনাপতি বুশার বললেন, 'ব্যাপারটা একটা আর্থিক সংঘর্ষ'। এও দেখলাম। এরপরেও কি বুঝতে বাকি থাকে ব্রিটিশ বেয়নেট ও বণিক এই ভ্রাতৃবিরোধের অধ্যায়ের সুযোগে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে? বাইরের হিন্দুগোষ্ঠীর লোকবল ও ধনবলের ভরসাতেই কি তবে শতকরা ২০ জন নোয়াখালিতে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে? নোয়াখালির পথে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম—বাংলার অখণ্ড জীবনযাত্রা এই হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি বিচ্ছেদের ও হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক আদর্শবিভ্রাটের ফলে কি খণ্ড, আত্মঘাতী দুই বাংলারই সৃষ্টি করবে?

হিন্দুর আত্মহত্যা

কলকাতা শেয়ালদা স্টেশনে পা দিয়েই বুঝলাম—আরো এক কঠিন সত্য। হিন্দুর ব্যক্তিগত ত্যাগ আছে, সংঘবদ্ধ সংগঠন নেই। দিনের পর দিন নোয়াখালি সম্পর্কিত রিলিফ কমিটিগুলির ধনিক-বনিক, স্বামী-সন্ন্যাসী, সম্পাদক-ব্যাঙ্কার মহলের সীমানায় দাঁড়িয়ে বুঝলাম—এক নির্মম মিথ্যা। নোয়াখালির হিন্দুর হতাশাকে অবলম্বন করেই তার ব্যাঙ্কার; রাজনীতিক ছোট-বড় দল-উপদলের আত্মপ্রসার ও আত্মপ্রচারের আশা ক্রমশ উগ্র ও সবল হয়ে উঠেছে। বিশজনকে আশিজনের থেকে ছিন্ন করে, একক ও একান্ত করে চলেছে তাদের রাজনৈতিক সরতঞ্জ খেলা। চিনলাম এক মূঢ়তাকে—হিন্দুসমাজ। এই ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যেও কোথায় ভারতীয় হিন্দুর মনে বাংলার হিন্দুর মনে, নোয়াখালির হিন্দুর মনে সেই বাস্তববোধ, সেই বৈজ্ঞানিক সংগঠন শক্তি, সেই নিষ্করুণ আত্মপরীক্ষা ও সুস্থ নবজীবনের পরিকল্পনা?

যে-বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করে কোনো মানবগোষ্ঠী ইতিহাসের পাতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখে তা শুধু ব্যক্তির ব্যক্তিগত বুদ্ধিবীর্য, আত্মত্যাগ নয়, তা হচ্ছে তার সামাজিক বোধ, তার সংগঠনশক্তি, সংঘবদ্ধতা। এই সংগঠনশক্তি না থাকলে ইতিহাসের ঝড়-ঝটিকা সে কাটিয়ে উঠতে পারে আর এক কৌশলে—শুধু বেতসবৃত্তির বলে, আপন সহনশীলতার বলে। ইতিহাসের বহু বিপদ কাটিয়ে ভারতবর্ষের হিন্দু অবশ্য এই জোরেই বেঁচে রয়েছে। কিন্তু এই প্রণালীতে ইতিহাসে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, করেছে অস্তিত্বরক্ষা। আজকের দিনে মানবেতিহাসে সুদৃঢ় সংঘশক্তির দাবি আরো অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, অখণ্ডতা চাই প্রত্যেক জীবন মানবগোষ্ঠীর, অথচ কোথায় হিন্দুগোষ্ঠীর মধ্যে সে চেতনা? হিন্দুর মতাদর্শ গঠিত হয়েছে অধিকার-ভেদকে আশ্রয় করে, ভাগে ভাগে তাকে

সাজিয়ে। হিন্দুসমাজ গড়ে উঠেছে বর্ণভেদকে আশ্রয় করে—স্তরে স্তরে তাকে সাজিয়ে। সংগঠন নয়, ভেদ হিন্দুত্বের মতবাদে ও তার দেহবিন্যাসে অপরিত্যাজ্য। সে জানে—সে ছোট জাতি কিংবা বড় জাতি, এই তার পরিচয়, সে জানে—গরুই তার দেবতা, কণ্ঠী, শাঁখা-সিঁদুরেই তার ধর্ম, এই তার অধিকার। যখন সে পরিচয় তার নষ্ট হল, সে অধিকার কেউ কেড়ে নিল, আজ সে ভাবে, তার আর রইল কি। হিন্দুর সংস্কৃতি তার নিজেরই নিয়মে হয়ে রয়েছে বিভেদের সংস্কৃতি—minority culture; শ্যামাপ্রসাদ-কিরণশঙ্করের জিনিস। হিন্দু তার দারিদ্র্যকে, নিম্নবর্ণকে—হাইমচরের, লক্ষ্মীপুরার নমঃশূদ্রকে কার্যত বঞ্চিত রেখেছে—যতই থাক সে হিন্দু সভ্যতার জ্ঞান ও দান। আজ বরং হিন্দু বলেই সে আর মানুষের মর্যাদাকে তার প্রাপ্য বলে ভাবতে পারে না। এই ভেদবোধের ওপরই আবার চেপে বসেছে একালের কাঞ্চন-কৌলিন্যের স্বার্থবোধ। তাই সমবায় ভিত্তিতে পুনর্বসতির কথা বললেও তা আজ হৃতসর্বস্ব ভাগ্যবানেরা গ্রহণ করবেন না। বাংলার কালচারের কোন দান হিন্দু-সাধারণ লাভ করেছে তবে।

সংস্কৃতির বিকৃতি

মুসলিম সংস্কৃতির ত্রুটি দেখেছিলাম : ইসলামের বাস্তববোধ একদিন আরব কৌমগুলিকে একত্র করে আরব সমাজকে সংগঠিত হবার শক্তি দিয়েছিল; মুসলমান ধর্মাবলম্বীর মধ্যেও একটা ধর্মগত গণতন্ত্র ও সাম্য স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু সে মুসলিম গণতন্ত্র রাষ্ট্র বা আর্থিক জীবনে বিস্তারিত হয়নি। মানুষকে মানুষ হিসাবে সে মর্যাদা দেয় না, মানুষকে স্বীকার করে মুসলমান হলে—শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে, আর চিরদিনই মুসলমান সংস্কৃতিও রয়েছে উপরতলার minority culture হয়ে, নাজিমুদ্দিন, সোহারাবর্দির কালচার, পাঁচু সেখ ও রহমানের তাতে অধিকার নেই। যতক্ষণ মুসলমান সংস্কৃতি আধুনিক মানবতার সেই সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গীন আদর্শে নিজেকে সঞ্জীবিত না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেও সৃষ্টি করবে তার সর্বস্তরে শুধু সংস্কতির বিকৃতি। নোয়াখালির ও বাংলার মুসলমানদের আজ তাই না এই বিকৃতি?

হিন্দুসভ্যতার শূন্যগর্ভতা দেখলাম—যত বড় হোক হিন্দুর আধ্যাত্মিক বুলি আর যত স্থিতিস্থাপকই হোক হিন্দুর সামাজিক গঠন, মানুষকে সে মানুষ হিসাবে গ্রহণ করে না, মানুষের মর্যাদা, 'মানুষের অধিকার' তার দৃষ্টিতে এবং সমাজব্যবস্থায় স্বীকৃত হয় না। 'আধুনিক মানবতার' যে আদর্শকে তাই বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের যুগ গ্রহণ করে—'বাঙালি কালচারের' বনিয়াদ স্থাপন করেছে তাতেও তাই অধিকার ভেদ দূর হয়নি। বাঙালির কালচারে তাই অধিকার রইল শুধু শিক্ষিত বাঙালির, ভদ্রলোক বাঙালির, 'বাবু' বাঙালির।

'এইখানে, ইউরোপে প্রকাশিত এই 'আধুনিক মানবতার' ক্ষেত্রেই আছে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালির একমাত্র মুক্তিক্ষেত্র—এ কথাই যখন সত্য, তখন কেন এ কথা

আপনারা বলেন না?' অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নোয়াখালির অন্ধকার আকাশে কোনো আলোকের সন্ধান না পেয়ে ক্ষোভের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলেন। নতুন সংস্কৃতির বন্ধনেই বাঙালি হিদু-মুসলমানকে মিলিত হতে হবে। আমি নোয়াখালির গোপাল হালদার, নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম—এই 'আধুনিক মানবতার' আদর্শকে কি তুমি স্বীকার করনি—তোমার কথায়, লেখায়, কাজে জীবনে? তুমি কি রূপ দিতে চাওনি সেই বাণীকে—জাতি নয়, বর্ণ নয়, এমনকি ধনবৈষম্যও নয়—'সবার উপরে মানুষ সত্য'? অন্ধকারে জ্বলে উঠল আলো। প্রথমেই পড়লাম নোয়াখালির 'সন্দীপী' লালমোহনের মৃত্যুর রক্তমাখা লিপি। বুঝলাম বাঙালির বিপ্লবী চেতনা আজও বিপ্লবী মর্যাদায় প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত কি? তবু জানি 'নোয়াখালির লাঞ্ছনা'—ব্যবসায়ীদের নিকট লালমোহনের আত্মদান সহজ মর্যাদা লাভ করবে না। কারণ লালমোহন 'আধুনিক মানবতা'র বোধে প্রবুদ্ধ, ইতিহাসের নতুন শক্তিতে আস্থাবান।

ব্যক্তির একান্ত পথকে এরূপ সমুজ্জ্বল করে তারপর জ্বলল নতুন আলো। নোয়াখালির গ্রামে আবির্ভূত হলেন গান্ধীজী। মহাত্মাজী একান্ত মানবাত্মার পূজারী; জীবনের চরম পরীক্ষায় তিনি অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর সাধনা বিশজনকে আশিজনের সঙ্গে সম্মিলিত করবার সাধনা। তাঁর পুঁজি ও পদ্ধতি ব্যক্তির সাহস, মানবাত্মার অপরাজেয়তা।

আর বহু সাহস, জনতার সহজ মানবতা, সহজ সংঘশক্তির সাধনা হাসনাবাদের। অন্ধকারের ভেতর জ্বলে রয়েছে পূর্বাপর হাসনাবাদে—সাংবাদিকদের ব্যবসায়ে তাও অবজ্ঞাত। হিন্দু ও মুসলমান সাধারণ মানুষ সেখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে মানুষ হিসাবে—সংগঠনশক্তিতে একত্রিত হয়ে। মানুষের অধিকার আদায় করবার দাবিতে সংঘবদ্ধ হয়ে; হিন্দুর আত্মরক্ষার, মুসলানের আত্মপরিচয়ের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে, সেখানে সংবাদ-ব্যবসায়ী বা বিবাদপশারী স্বচ্ছন্দ বোধ করে না। বুঝলাম—'আধুনিক মানবতার' সেই সংস্কৃতি পথ গড়ছে মূর্খ মানুষেরাই 'মানুষের অধিকারের' সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

স্বীকার করলাম নিজের কাছেই, মানবাত্মার একান্ত যাত্রার পথকে, সাধারণ মানুষ আমি আশ্রয় করতে অক্ষম। আর স্বীকার করলাম একান্ত বেদনায়—হাসনাবাদের মশাল আমরা নোয়াখালির হিন্দু নোয়াখালির মুসলমানের হাতে তুলে দিতে পারিনি; সেই পাপেই আজ জ্বলল নোয়াখালি, জ্বলছে প্রায় সমস্ত বাংলা—জ্বলল না 'আধুনিক মানবতার' নতুন শিখা, জ্বলল না মানুষের মুক্তির আলো—যুদ্ধান্তের সকল দেশের আকাশে লেগেছে যার রক্তিম ভাতি।

নোয়াখালির বদলা

পালিয়ে এসেছিলাম পাটনায়—ভয়ে নয়, লুকোদ্ধারের উদ্দেশ্যেও নয়, দেহের তাড়নায়। বসে বসে রাত জাগছি রুদ্ধশ্বাসে, বসে বসে দিন গুনেছি ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে—আর দেখেছি

'নোয়াখালির ওপিঠ'—আত্মঘাতী হিন্দুদের নিষ্ঠুর ঘাতকবৃত্তি—আর ভ্রাতৃবিরোধী মুসমানেরও ভ্রান্তি ও মূঢ়তা। ভয়ে, আতঙ্কেও, মানবতাকে বিস্মৃত হয়েছে এখানে সহস্র-সহস্র সাধারণ মানুষ আর তাদের উত্তেজনায় ইন্ধন জুগিয়েছে স্বার্থান্ধের দল। অগ্ন্যুৎপাতের শিয়রে দাঁড়িয়ে তেমনি নির্লিপ্ত দর্শকের মতো—সযত্ন হস্তে সমস্ত আবরণ সংবৃত করে রেখেছে বিহারের লাট-বেলাট ব্যুরোক্রাসি। শুধু তফাৎ এই—এই পরীক্ষার দিনে এখানে উত্তীর্ণ হয়েছেন পণ্ডিত জওহরলাল ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছেন বিহারের ব্যাকুল কংগ্রেস নেতৃত্ব আর সর্বোপরি তাদের সহায় হল গান্ধীজীর আবেদন ও উপবাসের সম্ভাবনা। দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে বিহারের সাধারণ মানুষের গ্রামকে তা একেবারে উদ্বুদ্ধ করেছে—বিহার কংগ্রেসের পাঁচ-টাকা রোজ জয়প্রকাশী বাহিনী নয়—গান্ধীজীর উপবাস-সম্ভাবনা ও সাধারণ কংগ্রেসীর প্রাণপণ প্রয়াস বিহারকে শান্ত করল। এই 'নোয়াখালির বদলা'র দ্বারা সংখ্যালঘু লিগ-বিরোধী দরিদ্র মোমিনদের, মত বিহারী মুসলমানকে, আজ তুলে দিয়েছে লিগের হাতে। শুধু বিহারে নয় সমস্ত ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের ঘটেছে পরাজয়।

এখানকার আশ্রয় কেন্দ্রকে আশ্রয় করে—তাই সোল্লাসে সমস্ত প্রদেশের মুসলিম লিগ লেগে গিয়েছে তাদের রাজনীতিক শতরঞ্জ খেলায়।

এও সেই নোয়াখালির হিন্দু নেতৃত্বের খেলারই ওপিঠ, তবে আরও জমাট। আর এ খেলা শুধু কংগ্রেসের ও হিন্দুর তো নিশ্চয়ই নয়। এ খেলা আজ চলেছে বিহারের দুর্গত মুসলমানেরও বিরুদ্ধে তাদের বাংলায় 'চালান' দিয়ে; এ খেলা চলেছে তাদের খাদ্য-বস্ত্র নিয়ে চোরাবাজারে পর্যন্ত; আর এ খেলা চলেছে ভিতরে ভিতরে বিভিন্ন প্রাদেশিক লিগের দল-উপদলের মধ্যেও। রাজা নাজিমুদ্দিন এসেছেন বাংলায় স্থানান্তরকরণের নিমন্ত্রণ নিয়ে। সোহারাবর্দির দালালরা অমনি জানায় 'উজীরে আজমের' নামে বাংলায় এই বিহারী বেরাদরি খেদমতের প্রতিশ্রুতি। বর্ধমানের আবুল হাসেম জানান বিহারের প্রান্তেই তিনি গৃহদ্বার খুলে বসে আছেন। ফজলুল হক আসেন শের-ই বাংলার মত লাফিয়ে হুমদদি জানাতে। আর বাংলা সরকারের বান্দা এন. এম. খাঁ আসেন পূর্ব-পাকিস্তানের পাকি চালে বিহারের দুর্গতদের 'সেবার' জন্য : ফিরোজ খাঁ বসে আছেন—গোরা ফৌজের বন্দুক-বেয়নেটের সাহায্যে নইলে আদায় করে কে? আর সর্বোপরি—কয়েদে আজম পেয়ে গিয়েছেন তাঁর পাকিস্তানিত পণের নতুন কিস্তির সুযোগ—শুধু পাকিস্তান আর নয়, লোক স্থানান্তর ছাড়াই আর পথ নেই; আর বিহারের পরে রাষ্ট্র-গঠন পরিষদের অধিবেশন এখন অসম্ভব। সহস্র সহস্র দুর্ভাগ্যগ্রস্থ নারী শিশু তাই চলেছে বাঙলার স্বর্গ-সুখের আশায়—কলকাতার গাড়িতে আর স্থান নেই—বিহারের শান্ত এলাকার মধ্যবিত্ত ছুটেছে। বিহারের শান্ত এলাকার গরিবও ছুটেছে—অনুতপ্ত সংখ্যাধিক্যের আহ্বানের অবসরও তারা দেয় না,

আহ্বানও তারা চায় না—'সোনার বাংলায়' অভাব কি? অভাব কি, জানি আমরা—যারা মন্ত্রীদের কর্মদক্ষতায় না পাই খাদ্য না পাই বস্ত্র, যা হাজার হাজার জমির ক্ষুধায় চড়াও হয় পূর্ব বাংলা ছেড়ে আসামে; যারা হাজারে কলকারখানায় চাকরি খুইয়ে ঘুরি পথে পথে; যারা 'সোনার বাঙলার' ম্যালেরিয়ার মহামারীতে বছরে বছরে মরি লক্ষে লক্ষে; যারা জানি বাঙলার বাঙলাভাষী মুসলমান ও উর্দুভাষী নাজিমউদ্দিন-ইস্পাহানি-সিদ্দিকিদের মধ্যে রেষারেষিটা কত তীক্ষ্ণ ও তীব্র। তবু কিন্তু গৃহে ফিরতে চায় না বিহারের গৃহহারা ও গৃহছাড়ারা। নোয়াখালির আশ্রয় প্রার্থীরাই কি ফিরতে চায় নিজ নিজ গৃহে শুধু মহাত্মাজীর নির্দেশে? ভয় ও সংশয় সকলখানকার উপদ্রুতদেরই প্রাণে প্রায় সমতুল্য; অবশ্য স্বীকার করবার উপায় নেই—নোয়াখালির বিভীষিকায় অবসন্ন হয়ে হিন্দু ক্রমশই খুইয়েছে তাদের সকল সাহস, আর বিহারের মুসলমান হাজারে হাজারে নিহত হয়েও ক্রমশই ফিরে পেয়েছে তাদের সহজ সাহস। কিন্তু তবু তারা ঘরে ফিরতে চায় না এ মুহূর্তে। নোয়াখালিতে যেরূপ বিহারে সেরূপ দ্বিধা আছে, শঙ্কা আছে; কিন্তু তারও চেয়ে বেশি আছে বিরোধকে চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী করবার চেষ্টা—শতকরা চোদ্দজনের পক্ষে এ বিরোধ ভয়ঙ্কর মূঢ়তা। তবু সে চেষ্টা এখানকার মতো সার্থক হবারই কথা। যখন মিলনের বাণী প্রচারের অধিকার বিহারের কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছ থেকে পান জয়প্রকাশজী; পায় না কমিউনিস্ট-পরিচিত কোনো ছাত্রদল, কোনো চিকিৎসক দল, কোনো কর্মী দল। ('অধিকার ভেদ'-বাদ কংগ্রেসেও সুস্পষ্ট)। আর, বিহারের রক্তরেখা শুখোতে না শুখোতেই গড় মুক্তেশ্বরের সীমাক্ষেত্র থেকে সর্দার প্যাটেল যখন হুঙ্কার দিচ্ছেন—'তলোয়ারের বদলে তলোয়ার'—তখন সাধারণ মূসলমান আর ঘরমুখো হতে ভরসা পায় কি সহজে? অন্যদিকে দিল্লীর তখ্ত থেকে জিন্না সাহেব যখন ঘোষণা করছেন—'বাসিন্দা বিনিময়েরই আজ প্রয়োজন; আর বাঙলার লিগ মন্ত্রীদল বিহারের ঘাড়ে, তখন বিহারের সাধারণ হিন্দু ও কংগ্রেসীরাই বা অনুতপ্ত বোধ করবে কেন? এখনো যে নোয়াখালির অপহৃতাদের উদ্ধারও হয়নি।

বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব

তলোয়ারের বদলে তলোয়ার? 'আধুনিক মানবতা' নয়, সংস্কৃতির বিকৃতি—ষোলই আগস্ট কলকাতায় এই নীতির উদ্বোধন দেখেছি। তারও পূর্বে এই পাটনাতেই নববর্ষ উৎসবে দেখেছি এই সম্ভাবনার আভাস; যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম প্রবাসী আত্মীয়দের, 'আজ কি আমাদের স্বাধীনতার নববর্ষ? না, আমাদের গৃহযুদ্ধের নববর্ষ? জনতার প্রেরণা ও উদ্যমের দিক থেকে দেখলে মনে হয় স্বাধীনতার। আর সংগঠন ও নেতৃত্বের দিকে দেখলে মনে হয়—গৃহযুদ্ধের (প্রভাতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩)।

এখন কি আর সন্দেহ আছে—মন্ত্রীমিশনের ও ওয়েভেল নেতৃত্বের নিকট ধরা দিয়ে কোথায় দেশকে টেনে নামিয়েছেন আমাদের কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কংগ্রেস পলিসি, লিগ নেতৃত্ব ও লিগ পলিসি? সিমলা প্রথম বৈঠক থেকে জাতীয় নেতৃত্বের এই দুই শাখার মধ্যে সেনাপতি ওয়েভেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘনায়িত করে তুললেন—সেদিন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বন্দ্বে পরিণত হতে লাগল। রাষ্ট্রপতি আজাদ, ওয়েভেলের শুভেচ্ছায় সমস্ত কংগ্রেসের আস্থা জানিয়ে ওয়েভেল-নেতৃত্বকেই স্বীকার করে নিলেন। বোম্বাই-এ নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন থেকে শুরু হল এই ওয়েভেল পূজা, আর কংগ্রেস-লিগের সংগ্রাম। নির্বাচনের অধ্যায় শেষেও দেশে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রেরণার ঝড় বইছে তখন দুই প্রতিষ্ঠান ও তার দুই বিরোধী নেতৃত্ব আমলাতন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সহায়তায় মন্ত্রিত্বের আশায় পরস্পরকে বানচাল করে চললেন। মন্ত্রীমিশন দেশে এল—দিনের পর দিন কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে তারা মধ্যস্থতার মর্কটলীলা চালাতে লাগলেন। মন্ত্রী-মিশনের সুদীর্ঘ আলোচনায় কংগ্রেস নেতা ও লিগ নেতাদের লাগিয়ে দিলেন আত্মবিরোধ; নিজের নিজের মন্ত্রীমিশনের সামনে প্রকাশ করবার দায়ে দুই বিরোধী নেতৃদল আবার ঘনিয়ে তুললেন নিজ নিজ অনুচরদলের মনে ভ্রাতৃবিদ্বেষ। ২১শে নভেম্বরের কলকাতায় ছাত্র বিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দীপনা, রশিদ আলি দিবসের সম্মিলিত বিদ্রোহ, নৌসেনা ও বিমান সেনাদের বিদ্রোহ—যুদ্ধান্তের জনতার প্রত্যেকটি বিপ্লবী অভ্যুত্থানকে তাই কংগ্রেস নেতৃত্ব বললেন 'গুণ্ডামি', লিগ নেতৃত্ব বললেন 'অন্যায়'—উভয়েই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনস্তুষ্টিতে উদ্‌গ্রীব, উভয়েই প্রত্যেকটি সম্মিলিত আন্দোলন থেকে নিজ নিজ জনতাকে বিচ্ছিন্ন রাখতে বদ্ধপরিকর। এখন সেখানে তাই এই বিচ্ছিন্ন-বিদ্বেষ বিষ-জর্জর জনতা দ্বন্দ্ব ও দাঙ্গায় অগ্রসর হল। ক্রিপস প্রস্তাবের মতই মিশনের চতুর প্লানে পাকিস্তানও আছে, হিন্দুস্থানও আছে, আছে রাজস্থান—আর যবনিকার অন্তরালে ইংলিশস্তান। তবু ও প্লানের ব্যাখ্যা নিয়ে নেতাদের বিরোধ চলল। সমস্ত প্লান মেনেও জিন্না বঞ্চিত হলেন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের দায়িত্ব থেকে—উল্টে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্ল্যান না-মানা (?) কংগ্রেসের নেতাদেরই হাতে দিলে সে দায়িত্ব। জিন্নার বহুদিনের স্বপ্ন ভেঙে গেল—'ব্রিটিশরা ভদ্রলোক নয়', এতদিনে তিনি তা বুঝতে পারলেন। আর কংগ্রেসের অনুগামীরা বুঝলে—এই প্রথম ভদ্রলোক হচ্ছে, জিন্নাকে আজ সুয়োরাণীর পদ থেকে নির্বাসন করেছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুয়োরাণী কংগ্রেস এবার হতে চলেছেন ওয়েভেলের পাটরাণী। অবশ্য কংগ্রেস পক্ষ বললেন, কংগ্রেস পাটরাণী হচ্ছে নিজের শক্তির জোরে, ওয়েভেলের সদিচ্ছায় বটে, লিবর-সুহৃদদের বন্ধুত্বের জোরেও বটে, কিন্তু প্রধানত কংগ্রেসের নিজের জোরেই। অতএব, কাগজে কাগজে কংগ্রেসের ঢাক-ঢোল বাজল, রব উঠল, থামাও রেলের ধর্মঘট, খতম করো ডাক ও তার কর্মচারীর ধর্মঘট, বন্ধ করো মিলিটারি একাউন্টসের কেরানিদের

ধর্মঘট, বিনষ্ট করো জাগ্রত ও সম্মিলিত জনতার 'উনত্রিশে জুলাই-র উদ্যম—সংগ্রামের দীক্ষা আর সম্মিলিত ঐক্যের শিক্ষা।' রইল শুধু একদিকে কংগ্রেসের 'প্রত্যক্ষ সহযোগিতা', ওয়েভেলের বন্ধুত্ব ব্রিটিশ নীতির সঙ্গে লিগকে ছেড়ে দিয়ে; আর অন্যদিকে লিগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ওয়েভেলের বন্ধুত্বের আশায়। —এল ষোলই আগস্ট।

তবু জোর করেই পতাকা ওড়াল কংগ্রেসের অনুগামী দল—পণ্ডিত জওহরলাল ওয়েভেলের মন্ত্রী হলেন, রক্তস্নাত কলকাতায় ঔদ্ধত্যের সঙ্গেই উড়ল কংগ্রেস পতাকা, পাল্টা ঔদ্ধত্যের সঙ্গে উড়ল কৃষ্ণপতাকা। সেই রক্তের স্রোতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামীরা এল আবার ওয়েভেলের পরিষদে—ঔদ্ধত্যের সঙ্গেই উড়ল তাদের সবুজ পতাকা—ওয়েভেল তাদেরও মুরুব্বি। তারপর নোয়াখালি-বিহারের পালা চলছে—অন্যদিকে অমলনের, গোল্ডেন রক, কোয়েম্বাটুর—আর তারই মধ্যে সাগরপারে নিজের প্রাণের শেষ ব্যাখ্যার অবকাশ হল মন্ত্রীমিশনের। ছ মাস যে কথার ব্যাখ্যায় কংগ্রেস ও লিগ নেতারা দেশে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, একদিনে 'ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তার চূড়ান্ত ব্যাখ্যা করলেন—রাষ্ট্র-গঠন পরিষদের ভিত্তিটুকুও উপড়ে ফেলে দিলেন এবার মন্ত্রীমিশন, আর তাদের এ-সবে দরকার কি—পাকিস্তান পাকা, আর কোনো দল রাজি না হলেও ভারতের স্বাধীনতার এই মিশন-প্ল্যান হবে বানচাল।

আজ ৯ই ডিসেম্বর। দিল্লীতে উদ্বোধন হচ্ছে প্রতিহত কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতের ভিত্তিহীন সেই 'রাষ্ট্রগঠন পরিষদ' কোনো ক্ষমতা নেই রাষ্ট্র-রচনার; জনগণের প্রতিনিধি কেউ নেই এখানকার আসরে—আসছে দোভাজা আইন সভার যত তেভাজা প্রতিনিধিরা; আসতে পারে দেশী রাজ্যের রাজাদের যত তাঁবেদাররা—তবু একেই ভারতের নেতারা চালাতে চেয়েছেন 'গণপরিষদ' নাম দিয়ে। এখানে এই অর্ধ-পরিত্যক্ত আসরে এখনো তবু তাঁরা ঘোষণা করতে পারেন এ পরিষদকে সার্বভৌম বলে, ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলে। আর মন্ত্রীমিশনের শিকল কেটে নামতে পারেন শেষ সংগ্রামে।

হয়ত কংগ্রেস সেই আশা পোষণ করে—ওয়েভেল-মোহ ও বিলাতি লেবর পার্টির অনুগ্রহের ওপর আর কতদিন টিকে থাকা যায়? কিন্তু এই কংগ্রেস-লিগ বিরোধের অভিশাপ মাথায় নিয়ে কংগ্রেস সেরূপ সংগ্রামে নামলে আজ আর '১৯৪২-এর আগস্ট' হবে না, হবে '১৯৪৬-এর আগস্ট', ভারতবর্ষের সর্বত্র নতুন 'নোয়াখালি', নতুন 'বিহার'। কারণ; কংগ্রেস সংগ্রাম ঘোষণা করলেই জিন্না ঘোষণা করবেন এ হচ্ছে মুসলমানের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চক্রান্ত—আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহলে নির্বিবাদে দূরে বসে থাকতে পারবে। তার চালে কংগ্রেস বা লিগ কোনো দলের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামই' আজ পরিণত হবে ভ্রাতৃহত্যায়।

জনতা ও গৃহযুদ্ধ

পুরানো পথে আজ আর কংগ্রেসের সংগ্রাম ঘোষণা সম্ভব নয়। সংগ্রাম আজ পরিচালিত

হতে পারে একমাত্র হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত দাবি আদায়ের জন্য, হিন্দু-মুসলমানের সমান স্বার্থকে আশ্রয় করে, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত শক্তিকে প্রয়োগ করে। আর সে স্বার্থ, সে দাবি, সে শক্তির মিল আছে একমাত্র জনতার মধ্যে—হিন্দু কৃষককে ও মুসলমান কৃষকের, হিন্দু শ্রমিকের ও মুসলমান শ্রমিকেরই এই যোগসূত্র আছে—এখনো অটুট—কলকাতা জ্বলে যায়, তার ফুলকি লেগে যায় মেটেবুরুজে, জ্বলে উঠেছে কাশীপুর, নারকোলডাঙা খিদিরপুর ও এখানে-ওখানে, কিন্তু বৃহত্তর কলকাতার শ্রমিক-বেষ্টনী মোটামুটি টিকে থাকে—নোয়াখালির পরেও। বিহারের পরেও—আজও চল্লিশ হাজার হিন্দু-মুসলমান মজুর সেখানে তাদের সম্মিলিত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ়তর করছে। নোয়াখালি-ত্রিপুরা জ্বলে যায়, কিন্তু হাসনাবাদে জ্বলে ওঠে ভ্রাতৃত্বের প্রদীপ। বতুরা তালিমপুর জেগে থাকে মিলনের বাণী নিয়ে। আর তেভাগার আন্দোলন আশ্রয় করে নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ থেকে শুরু করে সারা বাংলা হয়ে ওঠে কৃষকের সম্মিলিত অভিযানে প্রাণময়; বেওড়বোই, শেখপুর, গয়ায় খণ্ড জমির সংগ্রামে জনতা হয় জীবন্ত। উত্তর ভারতে ভ্রাতৃহত্যার মাতলামো জাগে, কিন্তু কাশ্মীরে চলে স্বাধীনতার জয়যাত্রা; ত্রিবাঙ্কুরে স্বাধীনতার সংগ্রামে অকুণ্ঠে প্রাণ দেয় সাধারণ নর-নারী, হায়দ্রাবাদের নিজাম-রাজ্যে প্রাণ দেয় দেশ গ্রামের অনাদৃত অচ্ছুৎ আর অব্রাহ্মণ মুসলমান। 'মানুষের অধিকারের' সংগ্রাম ভ্রাতৃহত্যার রক্তেও নিবে যায় না।

সংগ্রাম ও জনতা

কিন্তু এ সংগ্রাম কি আর কংগ্রেস পরিচালনা করতে পারে? লিগ ও মুসলমান সাধারণ কংগ্রেসের সে অধিকার মানবে না; লিগেরও সে অধিকার মানবে না; কংগ্রেস ও ভারতবর্ষের হিন্দু শিখ প্রভৃতি। আর এ দু-এরই কোনো শক্তি নেই তাদের রাজা নবাব বা বিড়লা ইস্পাহানিদের প্রভুত্ব ঠেলে ফেলার। এ দু-এরই কোনা অধিকার তাই মানবে না হিন্দুমুসলমান কৃষক ও শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান নৌ-সৈনিক ও বিমান সৈনিক। তারা মনে রেখেছে দিনের পর দিন গণ-জাগরণের বিরুদ্ধে ওয়েভেল চালিত 'কংগ্রেস' ও 'লিগের' বিরোধিতা, তারা মনে রেখেছে অমলনেরও গোলডেন রক, মনে রেখেছে কোয়েম্বাটুর ও ওয়ার্লি, মনে রেখেছে বার্নপুর ও দার্জিলিং-এর চা বাগানের অত্যাচার। মনে রেখেছে পরিষদে-পরিষদে জগজীবন রামদের শ্রমিক-বিরোধী কানুন, পন্থ-কিদোয়াইদের দমননীতি, প্রকাশম-পট্টভিদের বন্দুক ও লাঠি। তারা জানে—এ সংগ্রাম 'মানুষের অধিকারের' সংগ্রাম, জনতার স্বার্থে, জনতার স্বাধীনতার জন্যও জনতার বিপ্লবী পদ্ধতিতেই এ সংগ্রাম পরিচালিত হবে, পরিচালিত হবে জনতার নেতৃত্বে, তাদের লালঝাণ্ডার তলায়। তারা জানে এ সংগ্রাম এ পথেই পরিচালিত

হচ্ছে—সমস্ত চক্রান্ত সত্ত্বেও তা পরিচালিত হচ্ছে, ভ্রাতৃহত্যার সমস্ত রক্তপাত সত্ত্বেও তা ধুয়ে মুছে যায়নি। তারা জানে—যুদ্ধান্তের এই ভারতীয় গণ-বিপ্লবের বিরুদ্ধেই তৈরি হয়েছে এই প্রতি-বিপ্লবী রক্তপাত—এই ভ্রাতৃহত্যার চক্রান্ত—তার পরিচালনার নীতিতে ধরা দিয়েছে ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব, তার ধনিক নেতৃত্ব ও তার আত্মঘাতী জাতীয় নেতৃত্ব।

সাম্রাজ্যবাদের বৈষ্টনী

এ সত্য তো আমার পক্ষে দুর্বোধ্য ছিল না সেই নববর্ষের দিনেও এই পাটনায়। ওয়েভেলের উপর আস্থাবান হওয়ার মতো আমরা কোনো ঐতিহাসিক কারণও দেখি না, আজ তিনি সাময়িক গর্বনমেন্টে সেই একজনকে আর একজনের বিরুদ্ধে চাপিয়ে দিচ্ছেন বলে ক্ষুব্ধ হই না। এই তো তাঁর নীতি। সম্মিলিত জাতিসংঘের আসরে শত্রুস-সাট্‌স-বির্নেসের ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে একযোগে চক্রান্ত দেখেও আমি বিস্মিত হই না। এও আগেই জানি—এ আসরে তবু ভারতবর্ষ বন্ধুত্বলাভ করবে তাদের, যারা জনরাষ্ট্র জনশক্তিতে বিশ্বাসী। আমি যে জানি এ্যাটলি বেভিনসের সাম্রাজ্যবাদী নীতি পৃথিবীকে নতুন করে শৃঙ্খলিত করার আয়োজন করছে—ব্রিটিশ নীতিই গ্রীসের জনতাকে ব্রিটিশ বন্দুকের তলায় গুঁড়িয়ে দিয়ে গ্রীসে স্থাপিত করলে ব্রিটিশের নতুন সামরিক ঘাঁটি। তুর্কিকে তারা চালিত করছে সে উদ্দেশ্যেই ইন্দো-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভাবীদিনের ঘাঁটিরূপে। মিশরে পনের বছরের 'স্বাধীনতার' প্রহসন চালিয়ে এখনো ব্রিটিশই সমাসীন রইল বুঝে ব্রিটিশ সৈন্য আর বাণিজ্য নিয়ে। প্যালেস্টাইনে তারা সৃষ্টি করে ফেললে তাদের বিভেদের বলে নতুন আসন। ট্রান্স জর্ডনিয়া, ইরাক দলিত করে ইরানে আজ সবলে স্থাপিত হচ্ছে, ব্রিটিশ বাণিজ্য-রাজ্য থেকে সাম্রাজ্য; ব্রহ্মে, মালয়ে, ইন্দোনেশিয়ায়, হংকং-এ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বাণিজ্য ও সামরিক ঘাঁটি প্রতিদিন নতুন করে স্থাপিত হচ্ছে। আর প্রশান্ত মহাসাগরের তার বন্ধু মার্কিন চীনে, জাপানে দ্বীপে দ্বীপে নিজের অধিকার কায়েম করছে। এই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের না-নির্মিত সামরিক বেষ্টনী—যার ছোট বড় ঘাঁটি এখনো নির্মিত হচ্ছে ভারতের দেশীয় রাজ্যেও—আর এই যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি—এর মধ্যে কোথাও কি কিছুমাত্র ফাঁক আছে—বিন্দুমাত্র জনশক্তির প্রতি দরদ? তাহলে মাঝখানকার ভারতবর্ষকেই কি এই সাম্রাজ্য শৃঙ্খল থেকে ছাড়িয়ে এনে ব্রিটিশ লেবর পার্টি (কিংবা জিন্নার মতে চার্চিল-গোষ্ঠী) ভারতবর্ষকে তুলে দেবে ভারতবর্ষের জনতার হাতে? যুদ্ধান্তের পরিবর্তিত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বোঝা কি সম্ভব ছিল—এ্যাটলি-ওয়েভেল যে আজ ভারতবাসী ধনিক ও রাজাদের খানিকটা দিয়ে অনেকটা অধিকার নিজেদের হাতে রাখতে চায় তা নিতান্তই নিজেদের সাম্রাজ্যস্বার্থে। কারণ? না হলে যুদ্ধান্তের ভারতবর্ষ গণ-

বিপ্লবের পথে অগ্রসর, একেবারে মূলেই সে আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত অধিকার দূর করতে সক্ষম। সেই বিপ্লবের বিরুদ্ধেই সাম্রাজ্যবাদের বাঁধ এই মন্ত্রী-মিশন—তার প্রণীত প্লান, তার সৃষ্ট গৃহযুদ্ধ, তার প্রতি-বিপ্লবের আয়োজন। আর সেই প্রতি-বিপ্লবকে প্রতিরোধ করেই বিপ্লবের বাহিনী এগিয়ে চলেছে—বাংলার গ্রামে শহরে, বিহারের গ্রামে, ইউ-পির গ্রামে কাশ্মীর হায়দ্রাবাদ ত্রিবাঙ্কুরের দেশী রাজ্যে...

আর সংস্কৃতির ছাত্র হিসাবে আমরা জানি—'মানুষের অধিকারে'র এই বিপ্লবী সংগ্রামের পথেই আমাদের দেশ যখন নিচ্ছে আজ সেই নতুন সংস্কৃতি : আধুনিক মানবতাবোধ; আর তারই বিরোধিতায় প্ররোচিত হচ্ছে প্রতি-বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ—সংস্কৃতির যা বিকৃতি।

সংস্কৃতি, না বিকৃতি?

আমি নোয়াখালির গোপাল হালদার—যুদ্ধের দিনে বুঝতে পাচ্ছি হিটলার তোজোর মহিমা, ভুলতে পারিনি জনশক্তি অপরাজেয়; যুদ্ধান্তের পৃথিবীতেও দেখেছি, দিকে দিকে জনতার বিজয় যাত্রা আর ভারতের বুকে জনতার প্রস্তাব নৌ-বিদ্রোহীদের বন্দনা গানে উদ্বুদ্ধ হয়েছি, 'ঊনত্রিশে জুলাই'-এর বিপুল গণজাগরণে প্রস্তুত হয়েছি, ভুলতে পারিনি মন্ত্রমিশনের মন্ত্রে, গৃহযুদ্ধের দিনেও স্বীকার করিনি সংস্কৃতির বিকৃতিকে, চিনেছি প্রতিক্রিয়ার নবরচিত এই প্রতি-বিপ্লবকে, ভুলিনি অমর কাশ্মীর, অমর ঊনত্রিশে জুলাই, অমর হাসনাবাদের আহ্বান, ভুলিনি লালমোহনের রক্তের স্বাক্ষর, আর এই '৯ই ডিসেম্বর', আজই বা আমি ভুলি কি করে—বিপ্লবের অভিযান রচিত হচ্ছে ইণ্টারিম গবর্নমেণ্টের বৈঠকেও নয়, রাষ্ট্রগঠন পরিষদের অর্ধভগ্ন আসরেও নয়—বিপ্লবের অভিযান রচিত হচ্ছে আজ সম্মিলিত জনতার সংগ্রামে লাল ঝাণ্ডার তলায় বাংলায়, বিহারে, ইউপিতে, বোম্বাইতে, পাঞ্জাবে, কাশ্মীরে, হায়দ্রাবাদে, ত্রিবাঙ্কুরে—রচিত হচ্ছে জনতার রক্তে, জনতার নেতৃত্বে—জনতার শক্তিতে।

অমর জনতা—চিরজীবী বিপ্লব আর চিরজয়ী সংস্কৃতি! তবু নোয়াখালির গোপাল হালদার আমি—জানি জনশক্তিতে বিশ্বাসের মত 'ভুলও' আর কিছু নেই! তাই না যুদ্ধের দিন প্যাট্রিয়টিক-চোরাকারবারীরা প্রত্যেকই প্রমাণ দিতে পারত 'ট্রেটর'। যুদ্ধ শেষে ও নির্বাচনের মুখে নবোদ্ভিন্ন কংগ্রেসভক্ত প্রফেটিয়ররা ঢিল, লাঠি ও কমল দেগে অনায়াসে প্রমাণ করেছে 'দেশের শত্রু' কে ও কেমন করে করা যায় সাহিত্যের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস আদর্শের সেবা; আর আজ গৃহযুদ্ধের দিনেও সাহিত্যের সমাজপতিদের পক্ষে কত না দুঃখের কত না 'আশ্চর্য্যের বিষয়'—নোয়াখালির সেই লালমোহনরা ঃ 'দেশের কাছে স্বাধীন তার যুদ্ধে যাহাদিগকে নির্ভয়ে মৃত্যুবরণ করিতে দেখিয়াছি, ব্যক্তিগত চরমতম

অসম্মানকে তুচ্ছ করিয়া তাহারাই পলাইয়া বা ধর্মের ভোল বদলাইয়া বাঁচিয়া থাকিল কি করিয়া?'—না আছে তাদের ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স, না আছে তাদের এমনতর 'সংবাদ-সাহিত্যে' ফলাও-করা চোরাকারবার?

তবু আমি নোয়াখালির গোপাল হালদার বেঁচে রইলুম—এই ৯ ডিসেম্বরে হাঁচছি, কাশছি, হাঁফাচ্ছি, কিন্তু হাসছিও। জানি, 'ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে', বিকৃতি আপন উলঙ্গতার দ্বারাই সংস্কৃতিকে করে লজ্জিত, তারা প্রতিবিপ্লব এমনি করেই চোরাগোপ্তা ছুরি মারে বিপ্লবকে, তবু বিপ্লব হয় দীর্ঘজীবী, জনশক্তি হয় অপারজিত, আর সবার উপরে মানুষ সত্য হয়ে ওঠে।

*** *** ***

'...অতএব বাক্যের দ্বারা দূষিত ব্যক্তি কখনও দোষী হইতে পারে না। দুষ্ট ব্যক্তি যদি বিকৃত বাক্যে কোন বিপরীত বিষয় বলে অর্থাৎ জনসমাজে কোন ব্যক্তি কটুবাক্যে গালি দেয়, তবে ময়ূর যেমন আপন গুহ্যদেশ প্রদর্শন করত নৃত্য করিতে শ্লাঘা করে, অর্থাৎ আমি উত্তম নৃত্য করিতেছি, এই অভিমানে মত্ত হয়, তদ্রুপ নষ্ট লোক খল, 'আমি সমাজের অমুক মহৎ ব্যক্তিকে দুরক্ত বাক্য বলিয়াছি, এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকে, তজ্জন্য লজ্জিত হয় না। লোক-সমাজে যাহার কিছুই আবাচ্য বা আকার্য নাই, পবিত্রস্বভাব-সম্পন্ন মানবের সেই দূষিতচিত্ত খলের সহিত বাক্যালাপ করা বিধেয় নহে। যে ব্যক্তি সাক্ষাতে প্রশংসা করে এবং পরোক্ষে নিন্দা করিয়া থাকে, কুক্কুরে ন্যায় সেই মানবের জ্ঞান ও ধর্ম নষ্ট হয়। ...অতএব প্রাজ্ঞ পুরুষ সদ্যই তাদৃশ পাপচেতা সাধুবর্জিত ব্যক্তিকে কুক্কুর মাংসের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। ...যে ব্যক্তি অন্যে অপবাদ করিতে সতত নিবিষ্ট, সে মনুষ্যাকৃতি কুক্কুর স্বরূপ চীৎকারকারী; উন্মত্ত মাতঙ্গ ও অতিভয়ঙ্কর কুক্কুরের ন্যায় সেই অপ্রশস্ত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে।'

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উপদেশ
মহাভারত ঃ শান্তিপর্ব ঃ ১১৪ অধ্যায় ঃ ১৫০৫ পৃষ্ঠা
(বর্ধমান রাজবাটীর সংস্করণ)